বাংলাStreet.online

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

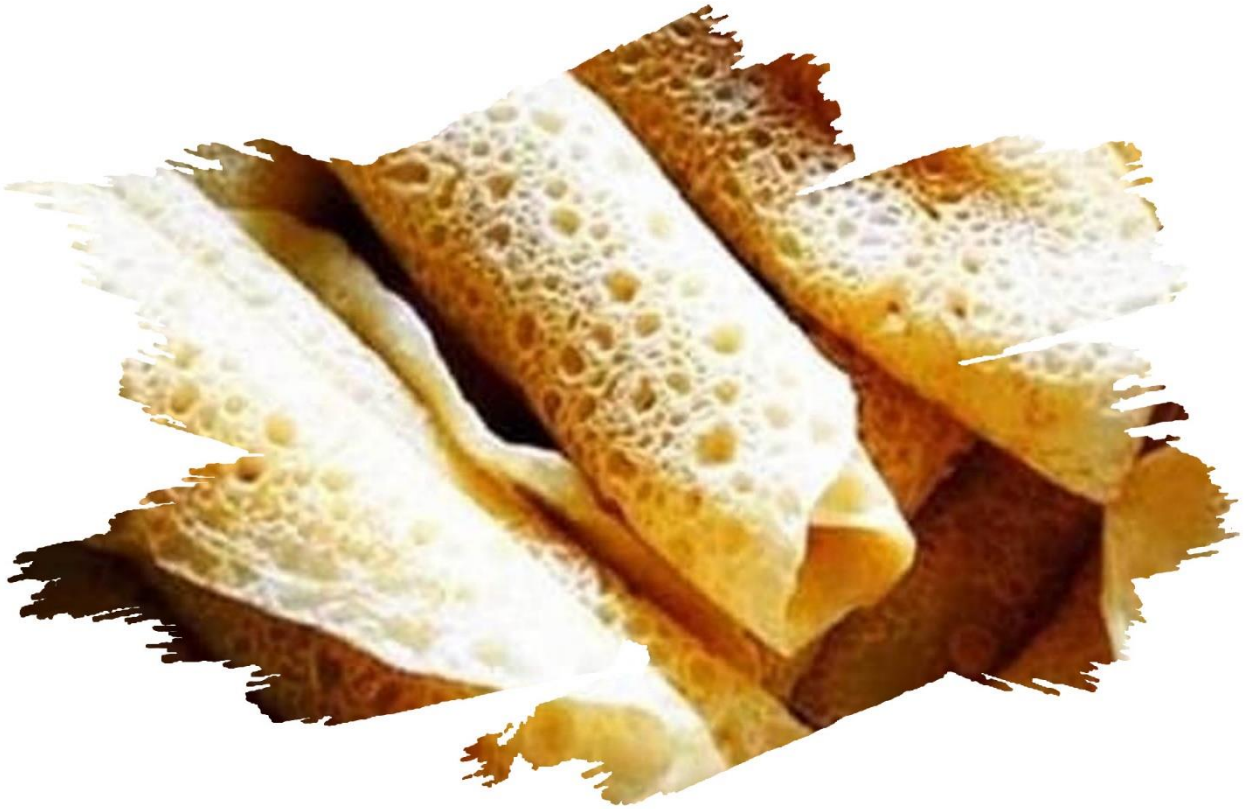

হেমন্তকালীন সংখ্যা

কার্তিক - অগ্রহায়ণ ১৪৩০

এসে গেল শীতের বেলা। দিন ছোটো হয়ে আসছে। শীত আর কলকাতা এই দুইয়েরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক উৎসবের আবহ। বড়দিন কলকাতার উৎসবের মানচিত্রে এক বিশেষ রঙে রাঙানো অদ্ভুত রঙিন মুহূর্ত। গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচেও এই সময়ে জমে উঠতে চলেছে অদ্ভুত মিষ্টি সব আনন্দের আসর। বছর ঘুরে আবার এসে গেল এই ঘনিয়ে আসা দিনগুলো, যখন হেমন্তের বিষাদ কুয়াশার আড়ালে চাপা দিয়ে মানুষ অপেক্ষায় থাকবেন আসন্ন বসন্তের আনন্দকে বরণ করে নেবার জন্যে। সবাই ভালো থাকুন। শীতের আমেজ গায়ে জড়িয়ে মিষ্টি রোদ শরীরে মেখে নিয়ে চলুন বাংলা স্ট্রিটকে সঙ্গী করে এক ছুটে ঘুরে আসা যাক কাছে-দূরে অন্য কোথাও।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

অবশেষে যাবতীয় উৎকন্ঠার অবসান। এই লেখা যখন লিখছি তখন টানা ১৭ দিনের মাথায় উত্তরকাশীর ব্রহ্মখাল-যমুনোত্রী হাইওয়ের ওপর ভেঙে পড়া নির্মীয়মাণ সিল্কইয়ারা সুড়ঙ্গের একাংশ থেকে উদ্ধার করা গেল ৪১ জন শ্রমিককে, যাঁদের মধ্যে আছেন বাংলার ৩ জন শ্রমিকও।

আমেরিকার উন্নত প্রযুক্তির অগার মেশিন অব্দি যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে এই জীবন জয়ের পথে সূর্যের উজ্জ্বল আলো দেখাতে পারল এমনকি ভারতের মতো দেশেও (যেখানে বহু দেশে নিষিদ্ধ হওয়া অনেক জিনিসই অনায়াসে বুক ফুলিয়ে ব্যবহার হয়) কয়লা খননে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া , অতি প্রাচীন বললেও কিছুই বলা হয় না এমন এক প্রযুক্তি 'র‍্যাট হোল টেকনিক' -ই। এই যে অদম্য জেদে আজ মানুষগুলিকে উদ্ধার করে আনা গেল তার জন্যে স্বস্তি আর আনন্দ জানানোর ভাষা নেই সারা দেশের। সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাংলা স্ক্রিটও আজ আনন্দিত কেবল নয়, গর্বিতও বটে। কারণ, আমরা পেরেছি সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১টি তাজা প্রাণকে উদ্ধার করতে। পেরেছি তাদের পাশে দাঁড়াতে। ফলে এই মুহূর্তে আর কোনো কথা নেই। জয় হোক ভারতের। এই ভাবেই আমরা যেন মানুষের পাশে অনমনীয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।জীবন জয় করে আনতে পারি নির্দ্বিধায়।

সূচিপত্র

গাজা : সমস্যার সমাধান কি আদৌ হবে ? Page 5
রতন দাশ

নতুন ভারত : একটি সমীক্ষা Page 7
নবীনানন্দ দাশ

সতী, অভিজিৎ ও নক্ষত্রচক্র (তৃতীয় ভাগ) Page 10
আদিত্য ঠাকুর

শেখ হাসিনাই বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল কারিগর Page 13
তরুণ চক্রবর্তী

চা থেকে সাবধান Page 18
অনিমেষ মিত্র

শীতে ভালো থাকুন Page 20
অলক সেন

বাড়ছে ক্যান্সারের ঝুঁকি Page 22
দেবদূত দাশগুপ্ত

কলকাতা ময়দানে খানাপিনার কমতি নেই Page 24
জয়ন্ত চক্রবর্তী

সময় ? ভবিষ্যৎ Page 27
দেবেশ সেন

এই ধুলো অমূল্য Page 29
সুগত সেন

পিপ্পা নিয়ে দু চারটি কথা Page 32
সুজিত কর

মোহময়ী কুর্গ (প্রথম ভাগ) Page 34
প্রভাত ভট্টাচার্য

অজানার উজানে (তৃতীয় ভাগ) Page 37
বাবলু সাহা

স্বপ্নভঙ্গ Page 40
অর্জুন দাশ

লেখা ১

গাজা : সমস্যার সমাধান কি আদৌ হবে ?

রতন দাশ

গাজা স্ট্রিপ ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ ভূমি কয়েক দশক ধরে সংঘাত ও উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু। অঞ্চলটির জটিল ইতিহাস ভূ-রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে যথেষ্ট জটিল বললে কেবল কমই বলা হয় না,খানিকটা সত্যের অপলাপই করা হয়।

গাজায় সংঘাতের সূত্রপাত বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, যখন ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব-ইজরায়েল সংঘাতের সময় ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত শরণার্থীরা জনসংখ্যার দিক থেকে এক অরথে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিল বলেই বিশেষজ্ঞদের মত।এই অঞ্চলটি তখন থেকেই রাজনৈতিক ও সামরিক লড়াইয়ের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে, যার মূলে থেকেছে ইজরায়েল-ফিলিস্তিনি সংঘাত।

গাজা তারপর থেকে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, এবং তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল ২০০৭ সালে ইসরায়েলের আরোপিত অবরোধ। এই অবরোধ, মিশরের বিধিনিষেধের সঙ্গে মিলিত হয়ে, এই অঞ্চলের ভিতরে এবং বাইরে পণ্য ও মানুষের চলাচলকে মারাত্মকভাবে সীমিত করেছে। খাদ্য, পানীয় জল এবং চিকিৎসা সরবরাহের মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির ঘাটতি সহ এর ফলে একটি তীব্র মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে।

গাজা উপত্যকা ইজরায়েল এবং ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একাধিক সামরিক সংঘর্ষের সাক্ষী হয়েছে, বিশেষ করে হামাস। এই সংঘর্ষের ফলে প্রাণহানি এবং পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে। গাজার বেসামরিক জনসংখ্যা প্রায়ই এই সংঘাতের শিকার হয়। বাড়িঘর, স্কুল এবং হাসপাতালগুলিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়।

গত কয়েক মাসে গাজার পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক মনোযোগ ও উদ্বেগ আকর্ষণ করেছে। বিভিন্ন দেশ, মানবিক সংস্থা এবং জাতিসংঘ একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং এই অঞ্চলের জনগণের দুর্ভোগের অবসানের আহ্বান জানিয়েছে। যুদ্ধবিরতি এবং শান্তি চুক্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু একটি স্থায়ী সমাধান অধরা রয়ে গেছে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলি বেসামরিক জনগণের উপর অবরোধের প্রভাব, সামরিক অভিযানে হিংস্রতা এবং মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে গাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে গাজার পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক আইন এবং এই সংক্রান্ত সমস্যাগুলির মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সম্পর্কে বিতর্কের উদ্রেক হয়েছে । গাজা স্ট্রিপ জটিলতায় ভরা একটি অঞ্চল হিসাবে রয়ে গেছে ।

সংঘাতের একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য ব্যাপক এবং বহুপাক্ষিক পদ্ধতির প্রয়োজন মূল কারণগুলিকে সামনে রেখে জড়িত সমস্ত পক্ষের বৈধ উদ্বেগকে স্বীকার করে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি খোঁজার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে । এই অবস্থায় পৃথিবী এমন একটি ভবিষ্যতের আশায় দিন গুনছে যখন গাজার মানুষ অন্তত একটু শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

হিসেব বলছে, ইজরায়েলে সামনেই ভোট। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর জনপ্রিয়তা একেবারে তলার দিকে বলেই আন্তর্জাতিক মহলের ধারণা।তাঁরা বলছেন যতই নেতানিয়াহু বলুন যে, যুদ্ধের পর গাজা দখলের বাসনা তিনি রাখেন না, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি কীভাবে বলছেন যে, এই ভূখণ্ড কেবল ইহুদিদেরই রাষ্ট্র ! এই সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান আদৌ সম্ভব কিনা তা অবশ্যই সময় বলবে কিন্তু এটাও ঘটনা যে অপমান ও শাস্তি বিধানের ক্ষমতা কেন্দ্রিক ধ্যান ধারণা থেকে অনড় রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করে যুদ্ধ আর গণহত্যার পরিস্থিতি গড়ে নিয়ে এই যে ভয়াবহতা এই শতক তা ইদানিং কালে দেখেছে বলে মনে তো হয় না।

লেখা ২

নতুন ভারত : একটি সমীক্ষা

নবীনানন্দ দাশ

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক মঞ্চে ভারতের ভূমিকাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এবং উন্নয়নের অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের অবস্থান ইতিমধ্যেই গতি লাভ করছিল। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল এর ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি। কয়েক বছর আগেও ভারত ছিল বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি, এর বৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে অনেক উন্নত দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। এই অর্থনৈতিক শক্তি বর্ধিত রাজনৈতিক প্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, যা ভারতকে বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে বলেই বিশেষজ্ঞদের মত।

আঞ্চলিক গতিশীলতা গঠনে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বৈদেশিক নীতি কৌশলের লক্ষ্য হল আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC) এবং বহু-ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার

জন্য বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ (BIMSTEC)-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক একীকরণকে উন্নীত করা।

ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া উভয়ের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখে। এটি কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে তার বিদেশ নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। মার্কিন-ভারত অংশীদারিত্ব বিশেষ করে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য এবং সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কয়েক বছর ধরে শক্তিশালী হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ফোরামে আরও দৃঢ়তার ভারত নিজের স্বার্থ জাহির করতে সক্ষম করেছে।

একই সঙ্গে, ভারত রাশিয়ার সঙ্গেও বিশেষ করে প্রতিরক্ষা খাতে ঐতিহাসিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। রাশিয়া ভারতের কাছে অস্ত্রের এক উল্লেখযোগ্য সরবরাহকারী। এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য রাখার কাজটি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়।

ভারত বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে ইতিমধ্যেই, যা বিশ্ব রাজনীতিতে তার অবস্থানকে চিহ্নিত করে। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব, নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) বরাবর চীনের সঙ্গে লাগাতার উত্তেজনা এবং আফগানিস্তানের অস্থিতিশীলতা এই অঞ্চলের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত করার এবং ভারতের পররাষ্ট্র নীতির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলির ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিক্রিয়া বিশ্ব মঞ্চে তার অবস্থান নির্ধারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলির মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও ভারতের ভূমিকা ক্রমশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেহেতু বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে লড়াই করছে, ভারতের বিশাল এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা কার্বন নির্গমনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। যাইহোক, ভারত সরকার পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রতি প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে এবং কার্বন নির্গমন কমাতে পদক্ষেপ নিয়েছে।

বৈশ্বিক মঞ্চে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রসারিত হচ্ছে। বলিউড, যোগব্যায়াম এবং ভারতীয় রন্ধনপ্রণালী একটি বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলেছে বলেই আন্তর্জাতিক মহল মনে করে, যা আন্তর্জাতিকভাবে ভারতের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরিতে অবদান রেখেছে। উপরন্তু, বিভিন্ন দেশে ভারতের সমৃদ্ধিশীল প্রবাসী সম্প্রদায় তার প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

বিশ্ব রাজনীতিতে আজ ভারতের অবস্থান তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব, জটিল আঞ্চলিক গতিশীলতা এবং বৈশ্বিক বিষয়ে একটি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি, আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব, কৌশলগত জোট এবং সফট পাওয়ার সবই বিশ্ব মঞ্চে ভারতের বিশিষ্টতার জন্য অবদান রেখেছে। যাইহোক, এটি আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলির মতো চ্যালেঞ্জগুলিরও সম্মুখীন হয়। এই চ্যালেঞ্জগুলিকে নেভিগেট করার জন্য ভারতের ক্ষমতা তার শক্তিকে পুঁজি করে বিশ্ব রাজনীতির ক্রমবর্ধমান ল্যান্ডস্কেপে নিজের ভূমিকাকে রূপ দিতে থাকবে বলেই আন্তর্জাতিক মহল মনে করে। বিশ্ব পরিস্থিতি পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভূমিকা নিশ্চয় আরও বিকশিত হবএ এবং ভারত আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব হিসাবে পরিগণিত হবে।

সতী, অভিজিৎ ও নক্ষত্রচক্র (তৃতীয় ভাগ)

আদিত্য ঠাকুর

আমরা আজ যা বিজ্ঞান বলে মানি তার ভাষা যেমন অঙ্ক এবং পরীক্ষার দ্বারা যাচাই ছাড়া কোন তত্ত্বকে যেমন গ্রহণ করি না, প্রাচীন কালে সেই অর্থে বিজ্ঞান প্রকাশিত হয় নি। জ্ঞানী মানুষ যাঁদের ঋষি বলে অভিহিত করা হত তাঁরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনেক সময়ই জটিলতার কারণে রূপকাকারে গল্প কাহিনীর মাধ্যেমে ব্যক্ত করতেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সত্যটি পৌঁছে দেওয়া সাধারণ মানুষের কাছে। অনেক পৌরাণিক আখ্যান আর লৌকিক উৎসবের দিকে ফিরে তাকালে ঘটনার উৎসমূলে আমরা প্রাকৃতিক জ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে খুঁজে পাব। এই নিয়ে বাংলা স্ট্রিট-এ চলছে একটি ধারাবাহিক। তৃতীয় ভাগ রইলো এই সংখ্যায়...

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঋগ্বেদীয় প্রারম্ভকালের শেষ পর্যায়ের সময় কাল ছিল ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। সেই সময়ই নক্ষত্রচক্র ২৭ ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। [জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক প্রামাণিক তথ্যের বিষয়ে পরে আলোচিত হবে।] ২৮ নক্ষত্রের বিভাগ তারও পূর্ববর্তী কোনো সময়ে ছিল। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ কালে আকাশের ২৭ নক্ষত্র ও নক্ষত্রভাগের সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমান সময়েও ২৭ নক্ষত্র বিভাগ আগের মতই আছে। নক্ষত্রভাগের ক্ষেত্রে বর্তমানে অশ্বিনী নক্ষত্রকে ১ম ভাগ ধরা হয়। এভাবে ২য় ভাগ ভরণী, ৩য় ভাগ কৃত্তিকা,... ক্রমে ২০তম ভাগ পূর্বাষাঢ়া, ২১তম নক্ষত্র উত্তর-আষাঢ়া, ২২তম নক্ষত্র শ্রবণা,...এবং শেষ বা ২৭তম নক্ষত্র রেবতী। তবে আর একটি নক্ষত্রের অবস্থান, যার উল্লেখ আগে

করা হয়েছে, অর্থাৎ যেটিকে গণনায় অন্তর্ভুক্ত করলে নক্ষত্র সংখ্যা আটাশ হয়, তার অবস্থান কোথায় ছিল? বর্তমান নক্ষত্র চক্রের বাইরে অবস্থিত এই তারাটির নাম অভিজিৎ।

অভিজিৎ বা Vega, Lyra বা বীণা মণ্ডলের উজ্জ্বলতম তারা। পৃথিবী থেকে ২৬ আলোকবর্ষ দূরে, উত্তর আকাশে অভিজিতের অবস্থান। উজ্জ্বল এই তারাটির ঔজ্জ্বল্য +০.০৩। অভিজিৎ রাশিচক্রে অবস্থিত নয়, রাশিচক্র থেকে বেশ কিছুটা উত্তর আকাশে অভিজিতের অবস্থান।

অভিজিতের প্রকৃত স্থিতি কী ছিল তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈদিক মতে অভিজিৎ নক্ষত্রের অবস্থিতি ছিল উত্তর-আষাঢ়া নক্ষত্র ও শ্রবণা নক্ষত্রের মধ্যবর্তী অংশে। পৃথিবীতে যেমন অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা দ্বারা পৃথিবীর ওপর কোনো একটি বিন্দুর অবস্থানের নির্দিষ্ট করা হয়, আকাশের ক্ষেত্রেও তেমনই ব্যবস্থা আছে। আকাশে অক্ষাংশের বদলে আছে Declination এবং দ্রাঘিমার বদলে আছে Right ascension. আকাশ বিষুব (Celestial Equator) বৃত্ত এবং ক্রান্তিবৃত্তের দুটি ছেদ বিন্দুর যে বিন্দুতে সূর্য অবস্থান করলে বসন্ত ঋতুর আগমন হয়, সেই বিন্দুতে Declination (Dec) হয় শূন্য। বিন্দুটির নাম Vernal Equinoxial point or first point of Aries (Tropical). এই বিন্দুটি থেকে আকাশ বিষুবকে পূর্ব দিক বরাবর ২৪ ভাগে ভাগ করলে দ্রাঘিমাংশের মতো যে ভাগ হয় তাকে Right Ascension (RA) বলে, মাপা হয় ঘন্টা, মিনিট ও সেকেন্ডে। আকাশের জ্যোতিষ্কদের অবস্থান RA এবং Dec এর সাহায্যে নির্দিষ্ট করা হয়। [ইচ্ছুকরা প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পড়ে দেখতে পারেন।] আকাশ বিষুবের উত্তর ভাগে ডেক্লিনেশন ধনাত্মক এবং দক্ষিণ দিকে ডেক্লিনেশন ঋণাত্মক হয়। আকাশের এই স্থানাংকের হিসাবে বর্তমানের ২১ নং নক্ষত্র উত্তর-আষাঢ়া, এটির যোগতারার (সিগমা স্যাজিটারি) RA = 18hour 55 minute (Angular) ও Dec = (-)27°18'। আবার ২২ নং শ্রবণা নক্ষত্রভাগের যোগ তারা শ্রবণার (আলফা অ্যাকুইলি) Ra = 19h 51m এবং Dec = + 8°52'। অথর্ববেদ এবং যজুর্বেদের নক্ষত্রভাগ অনুসারে ওপরের দুটি তারার মধ্যবর্তী অঞ্চলেই অভিজিৎ নক্ষত্রভাগের অবস্থান ছিল।

অতীতের অভিজিৎ নক্ষত্রকে নক্ষত্রক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। আকাশে নক্ষত্রক্রম গুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উত্তর-আষাঢ়া নক্ষত্র এবং শ্রবণা নক্ষত্রের মধ্যবর্তী

আরও একটি নক্ষত্রভাগের স্থিতি থাকা বেশ কষ্ট কল্পিত। সোজা কথায় আরও একটি নক্ষত্রভাগের স্থান অকুলান হচ্ছে। সুতরাং অভিজিৎ নক্ষত্রকে নক্ষত্রক্রম থেকে বাদ দিলে সবদিক থেকেই সমতা বজায় থাকে।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে "ভারতীয় অব্দরীতি প্রবন্ধে বলেছেন সতী বলে যাকে অভিহিত করা হয়েছে তা অভিজিৎ। দক্ষযজ্ঞের একই ধরনের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞ পণ্ডিত W. Brennand তাঁর Hindu Astronomy গ্রন্থে। তিনি অবশ্য তাঁর বইতে সতীর স্থলে দুর্গার কথা বলেছেন।

উত্তর-আষাঢ়া, অভিজিৎ ও শ্রবণা এই তিনটি নক্ষত্রের জন্য যে কৌণিক পরিমাণ আকাশের অংশের প্রয়োজন তা হল ১২° ৫১'২৫.৭১"×৩ বা ৩৮° ৩৪'১৭.১৪" – আকাশের ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থান (তিনটি নক্ষত্রভাগ পরিমাণ) বা আকাশ বাস্তবিক ভাবেই নেই। সুতরাং এই ঠাসাঠাসি স্থানে সূর্য এসে উপস্থিত হলে, সময় গণনায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা। সুতরাং অভিজিৎকে নক্ষত্রক্রম থেকে বাদ দিতে পারলে সর্বাংশে শ্রেয়। একটা নক্ষত্রভাগকে এইভাবে নেই বলা বা আগামী দিনে ক্রম থেকে ছেঁটে ফেলা খুবই অসুবিধা জনক। কিন্তু প্রকৃতির অপার রহস্য এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্য সেই যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি অযাচিত সুযোগ করে দিয়েছিল।

চতুর্থ ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

লেখা ৪

শেখ হাসিনাই বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল কারিগর

তরুণ চক্রবর্তী

তাঁর বাবা স্বপ্ন দেখেছিলেন, 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার। সেই স্বপ্নকেই বাস্তব রূপ দিচ্ছেন, বাংলাদেশের জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে সুযোগ্য কন্যা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর কারণেই বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ গোটা দুনিয়ায় প্রশংসিত। বাংলাদেশের মানুষ আজ হাসিনার কারণেই দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে অনেকটাই মুক্ত। বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ আজ ভারতকেও টেক্কা দিচ্ছে। আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িক চেতনাতে কাজে লাগিয়ে শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বই বাংলাদেশকে স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে চালিত করে চলেছে। সংখ্যাতত্ব তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। কোভিড বৈশ্বিক মহামারির পরেও বাংলাদেশের অগ্রগতি অব্যাহত।

কোভিডের আগে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৪ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি ছিল ৮.২ শতাংশ। তবে,২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩.৪ শতাংশে নেমে আসে। তাও দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেসগুলোর থেকে ভালো ছিল বাংলাদেশ। ফের ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৯ শতাংশে ফিরে আসে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৭.২৫ শতাংশ। শিল্প ও পরিষেবা খাতে সরকারে ব্যাপক সহায়তার কারণেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। হাসিনা সরকারের প্রবৃদ্ধি-সমর্থক মুদ্রানীতিতে বেসরকারি ও

সরকারি উভয় ক্ষেত্রেই অর্থের জোগান ছিল চোখে পড়ার মতো। গত ১৪ বছরে দেশের গড় জিডিপি ছিল ৬.৭ শতাংশ।

২০১৫ সালের ১ জানুয়ারী বিশ্বব্যাংকের মান অনুযায়ী নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত হয়েছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকেও উন্নত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৭-০৮-এর ৬৮৬ মার্কিন ডলার থেকে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে হয়েছে ২ হাজার ৭৬৫ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশের তুলনায় ২০২২ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১৮.৭ শতাংশ। অতি-দারিদ্র্যের হার ২৫.১ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০০৯-১০ সালের ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯ গুণ বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশের জিডিপি ছিল মাত্র ৬.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৯ সালে তা ১০০ বিলিয়নে উন্নিত হয়। আর ২০২১-২২ অর্থবছরে আরও চার গুণ বেড়ে বাংলাদেশের জিডিপি দাঁড়ায় ৪৬০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জিডিপির বহর অনুযায়ী, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ছিল ৬০তম অর্থনীতি। এটি এখন বিশ্বের ৩৫ তম অর্থনীতি। ২০৩৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ২৪ তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের আগে শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি ছিল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং সমতাভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অবকাঠামোসহ সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমেরচিত হয়েছে উন্নত সমৃদ্ধ-স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য টেকসই ভিত্তি। সকলের জন্য পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়াসে সফল বাংলাদেশ। জলবায়ু-সহনশীল অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার ওপরও যত্নশীল সরকার। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলির উন্নয়নের সঙ্গে তালমিলিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছিল খুবই জরুরি। তাই যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটিয়ে, ঢাকা মহানগর থেকে চাপ কমিয়ে সাব-স্মার্ট টাউন তৈরি করার প্রয়াস হাতে নিয়েছে সরকার। আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তির নতুন নতুন সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ অবকাঠামোতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং স্বল্প-দক্ষ উত্পাদনকে একটি আধা-দক্ষ পরিবেশে উন্নতি করারও চেষ্টা চালাচ্ছে বর্তমান সরকার।

তাই ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলা হবে। স্মার্ট বাংলাদেশের অর্থ হচ্ছে, স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট অর্থনীতি। 'স্মার্ট

বাংলাদেশ'-এ মাথাপিছু আয় হবে কমপক্ষে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার। ৩ শতাংশেরও কম মানুষ থাকবে দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং চরম দারিদ্র্যে কেউ থাকবেনা। মূল্যস্ফীতি সীমাবদ্ধ থাকবে ৪-৫ শতাংশের মধ্যে; বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের নিচে থাকবে; রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ২০ শতাংশের উপরে হবে; বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৪০ শতাংশ। বাংলাদেশ শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সাক্ষরতা অর্জন করবে। স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যাবে সবার দোরগোড়ায়। স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেকসই নগরায়ন সহ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিষেবা তাদের দোরগোড়ায় থাকবে। একটি কাগজবিহীন ও নগদবিহীন সমাজ তৈরি হবে। সবচেয়ে বড় কথা, স্মার্ট বাংলাদেশে ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সরকার নিশ্চিত করেছে সমাজ, গণতন্ত্র এবং অর্থনীতিতে সর্বাধিক অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেকের প্রাপ্যতা, ক্রয়ক্ষমতা এবং তথ্য প্রযুক্তিতে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি প্রচারের জন্য বিভিন্ন বহুমুখী প্রচারনাও থাকছে। বর্তমানে, কোনো ধরনের ডিজিটাল সুবিধা পেতে মোবাইল ফোনের সংযোগও এখন অপরিহার্য নয়। নিকটতম ডিজিটাল সেন্টার থেকে এই সরকারি পরিষেবাগুলি পাচ্ছেন নাগরিকরা। জাতীয় পোর্টালের অধীনে প্রয়োজনীয় সরকারি পরিষেবাগুলির সাথে অনেকগুলি বেসরকারী পরিষেবাও যুক্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশে এখনই বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক সংযুক্ত। আগামীদিনে মানুষকে তার যাবতীয় অধিকার ডিজিটালি ভোগ করার সুবিধা দিতে চায় আওয়ামী লীগের সরকার।

২০০৭ সালে দেশে মোট কর্মসংস্থান ছিল ৪ কোটি ৭৩ লাখ। আওয়ামী লীগের বর্তমান সরকার ২ কোটি ৩৫ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ২০২৩ সালের শেষে মোট কর্মসংস্থান ৭ কোটি ১১ লাখে পৌঁছাবে। মহামারীর সময়কার ছাঁটাই ধরেও বেকারত্বের হার ২০১০ সালের ৪.৫ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৩.২ শতাংশে নেমে এসেছে। কর্মক্ষেত্রে, নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ২০১৬ সালের ৩৬ শতাংশ ২০২২ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২.৭ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে ‘প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ’ - কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের শতভাগ জনসংখ্যাকে বিদ্যুতের আওতায় আনা হয়েছে। বিদ্যুত উৎপাদনের ক্ষমতা ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে ২৭ হাজার ৩৬১ মেগাওয়াট। ২০০৯-১০ সালে উতপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ৪ হাজার ৯০০ মেগাওয়াট। দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে জ্বালানি নিরাপত্তা একান্ত প্রয়োজন। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সৌর ও বায়ু উৎপাদন ক্ষমতার মতো বিকল্প শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সাফল্য রয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ নির্মাণে

বাংলাদেশ রাশিয়ান ফেডারেশনের স্টেট নিউক্লিয়ার এনার্জি কর্পোরেশন রোসাটমের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। প্রথম ইউনিটটি ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ এবং দ্বিতীয় ইউনিটটি ২০২৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্পূর্ণরূপে চালু হলে, বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনকারী দেশগুলির অভিজাত ক্লাবে যোগ দেবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তব সত্য। ৪ হাজার ৫৫০টি ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সমুদ্রের তলদেশে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন এবং মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ৪ হাজার ৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কোভিড মহামারীর পরবর্তীতে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য ডিজিটাল সংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ৩ দেশটিকে ৩৭টি বিমান এবং ১২ মিলিয়ন যাত্রীর চলাফেরার উপযুক্ত হয়ে উঠছে। টার্মিনালে নির্বিঘ্ন যোগাযোগের জন্য থাকছে মেট্রো রেল সংযোগ। কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের বাড়তি সুবিধা হবে। টার্মিনালটি রফতানি বাণিজ্যে যুক্ত করবে বহুমুখী সুবিধা। বর্তমানে, প্রকল্পটি জাপানি নির্মাতা শিমিজু এবং কোরিয়ান কোম্পানি স্যামসাং দ্বারা যৌথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পদ্মা সেতু ও মেট্রো রেলের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পায়রা সমুদ্রবন্দর, মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দরসহ আরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের সমাপ্তি, অর্থনীতির সাফল্যে নতুন মাত্রা যোগ করবে। পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং যুব কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি বাস্তবায়নের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অগ্রগতি পুরস্কার পেয়েছেন। আনুমানিক ১৭০ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ।স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল রাষ্ট্রে সরকারের নীতির রূপান্তর আজ গোটা দুনিয়ায় প্রশংসিত। বহু-জাতিগত গণতান্ত্রিক পরিবেশও আওয়ামী লীগের বড় সাফল্য। জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে জঙ্গিবাদ-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ। মায়ানমার নিয়ে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে বহু দেশ।

২০০৮ সালে গড় আয়ু ছিল ৬৬.৮। ২০২১ সালে বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু দাঁড়িয়েছে ৭২.৩ বছর। ২০০৮ সালের সাক্ষরতার হার ৫৫.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২১ সালে হয়েছে ৭৬.৪ শতাংশ। প্রাথমিক শিক্ষায় তালিকাভুক্তির হার প্রায় ৯৮

শতাংশে পৌঁছেছে। কারিগরি শিক্ষার হার ২০১০ সালে মাত্র ১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১৭.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

২০০৮ সালে বাংলাদেশে ১ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ছিল ৪১। ২০২১ সালে সেটা কমে দাঁড়ায় হাজারে ২২। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ২০০৫ সালে প্রতি হাজারে ৬৮ থেকে কমে ২০২১ সালে প্রতি হাজারে ২৮ হয়েছে। চিকিৎসাগতভাবে প্রশিক্ষিত জন্ম পরিচারকের সংখ্যা ২০০৪ সালে ১৫.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ৫৭.৯ শতাংশে পৌঁছেছে। এখন পরিশ্রুত জল পাচ্ছেন দেশের ৯৭ শতাংশ মানুষ।

সংখ্যাই কথা বলে। বিভিন্ন সূচকেই স্পষ্ট, গত দেড় দশকে বাংলাদেশ প্রভূত উন্নতি করেছে। সেই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতেই আওয়ামী লীগ ফের সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। অপপ্রচার চলছে। মানুষ বিভ্রান্ত করতে আন্তর্জাতিক কিছু দুষ্টুচক্র এবারও সক্রিয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ বুঝেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আগলে রাখতে, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, সকল মানুষের মুখে দুবেলা ভাতের বন্দোবস্ত করতে আওয়ামী লীগের বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাই পারেন দেশকে সমৃদ্ধির পথে চালিত করতে, এটা আজ প্রমাণিত।

লেখা ৫

চা থেকে সাবধান

অনিমেষ মিত্র

সকালে ঘুম ভাঙলেই চায়ের কথা মনে পড়ে। বিশেষত শীতকালে। তখন সকাল বা সন্ধ্যায় তো বটেই, তার মাঝখানে অনেকবার চা না খেলে কি চলে না ? মনে হয় কি চা না খেলে শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে ? সাবধান।

কারণ, চায়ের আসক্তি তৈরি হয় খুব সহজে।

সাধারণত চা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। তবে অতিরিক্ত চা খেলে কিন্তু স্বাস্থ্য জনিত বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে। এমনকী তা বিপজ্জনকও হতে পারে। দেখে নেওয়া যাক অতিরিক্ত চা-পান থেকে কী ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে : বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দিনে একাধিকবার চা পান করলে শরীরে আয়রনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তাদের বক্তব্য , চা পাতায় ট্যানিন নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে, যা শরীরে উপস্থিত আয়রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। সেই কারণে যেকোনো মানুষ রক্তাল্পতার শিকার হতে পারেন। ফলে যাঁরা আগে থেকেই রক্তাল্পতায় ভুগছেন, তাঁদের চা থেকে খানিকটা দূরে থাকাই উচিত মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, চায়ের আসক্তি তৈরি হলে এরকম ব্যক্তির সমস্যা আরও বাড়তে পারে।

তবে শুধু এটুকুই নয়। চায়ের আরও অনেক উপাদানই অতিরিক্ত শরীরে গেলে রোগভোগের আশঙ্কা বাড়তেই পারে। যেমন, – অতিরিক্ত চা পান করলে অস্থিরতা তৈরি

হতে পারে, ক্লান্তিও আসতে পারে। চা পাতায় প্রচুর পরিমাণে ক্যাফেইন থাকে। এর ফলেই শরীরে অস্থিরতা ও ক্লান্তি বাড়ে। রোজ যত বেশি চা পান করবেন কোনো ব্যক্তি, তত তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে বলছেন তাঁরা। অতিরিক্ত ক্যাফেইনের কারণে অনিদ্রার মতো সমস্যা হতে পারে ।ফলে, যাঁরা আগে থেকেই অনিদ্রার মতো সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের চা কম পান করা উচিত।

এছাড়া, চা পাতায় এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা বমি বমি ভাব তৈরি করে। চায়ের প্রভাবের কারণে আমাদের বারবার বমি হওয়ার মতো অনুভূতি হতে পারে। আর দেখা গেছে অতিরিক্ত চা পানের কারণে অনেক সময়ই পেটের সমস্যা তৈরি হয়ে থাকে। অতিরিক্ত চা পানের অভ্যাস থাকলে অ্যাসিডিটি এবং গ্যাসের মতো সমস্যাও হতে পারে। এসব কারণে তাঁরা

বলছেন, গর্ভবতী মহিলাদের যে কোনো পরিস্থিতেই চা এড়িয়ে চলা উচিত বলে মত তাঁদের।

লেখা ৬

শীতে ভালো থাকুন

অলক সেন

শীতের শুরুতে ঠান্ডা লাগার সমস্যায় ভুক্তভোগী অনেকেই। সর্দি, কফ, কাশিতে কাবু সকলে। শীতের মরশুমে মন খুলে উপভোগ করতে চাইলেও বাধ সাধে সর্দি কাশি। তবে কিছু ঘরোয়া টোটকা কাজে লাগিয়েই সর্দি-কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞরা তেমনই একটি অতি সাধারণ উপাদানের খোঁজ দিচ্ছেন।

শীতের সবজি বললে প্রথমেই মনে আসে বিট আর গাজরের কথা। শীতে অনেক কম দামেও পাওয়া যায় গাজর। তবে শুধু মরশুমি সবজি বলেই নয়, গাজরের একাধিক উপকারিতা রয়েছে। বিশেষত চোখের জন্য অত্যন্ত উপকারী এই সবজি। গাজর ত্বকের জন্যেও ভীষণ লাভজনক। কিন্তু সঠিক উপকারিতা পেতে কীভাবে খাবেন গাজর?

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন গাজরের উপকারিতা সম্বন্ধে। খনিজ ও ফাইবার ছাড়াও এতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, কপার এবং ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি। এতে উপস্থিত ভিটামিন এ চোখ শুষ্ক হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং রেটিনা ও লেন্সকে ভাল রাখে। কম্পিউটার, মোবাইলের মত বিভিন্ন

ব্লু স্ক্রিনে অত্যধিক সময় দেওয়ার জন্য চোখের সমস্যায় এই মুহূর্তে আট থেকে আশি সকলেই ভুগছেন। তাই গাজর খাওয়া অত্যন্ত উপকারী।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গাজরে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিনয়েড (এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট) পাওয়া যায়। এটি ত্বকের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয়। এমনকী ত্বকের ক্ষত সারাতেও কাজে লাগে গাজর। গাজরে উপস্থিত ক্যারোটিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে কার্যকরী। ত্বকের দাগছোপ কমাতেও সক্ষম গাজর।

নিয়মিত গাজর খেলে কমতে পারে ওজনও। কারণ এতে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেক বেশি, প্রায় ৮০ শতাংশ। গাজরে খুব কম ক্যালোরি রয়েছে। এটিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে এবং সেইসঙ্গে গাজরে ফ্যাটের পরিমাণ কম। ফলে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যায়। তাই ওজন কমাতেও ভরসা রাখতে পারেন গাজরে। গাজরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। ফলে এটি রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। গাজরে থাকা ফাইবার রক্তে গ্লুকোজের সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি নিয়মিত গাজরের রস খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এটি হজমেও সহায়ক।

শীতের মরশুমে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে সর্দি কাশি শুরু হলে সুস্থতায় কাজে দেবে আলকুশি বা কোঁচ। কোঁচের কালো বীজ ঠান্ডা লাগার চিকিৎসায় অত্যন্ত উপকারী। গ্রাম গঞ্জে ঝোপেঝাড়ে হয়ে থাকে আলকুশি গাছ। আগাছার মতো বেড়ে ওঠে। অনেকেই দেখে থাকলেও এর বিশেষ গুণের সঙ্গে পরিচিত নয়। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন এই বীজ ঠান্ডা লাগা রোধে কীভাবে খাওয়া যেতে পারে। আলকুশি বা কোঁচের বীজ গুঁড়ো করে নিন। এই গুঁড়ো ফুটন্ত জলে মিশিয়ে মধুর সঙ্গে সেবন করুন। ঠান্ডা লাগা রোধে অত্যন্ত উপকারী এই পানীয়।

লেখা ৭

বাড়ছে ক্যান্সারের ঝুঁকি

দেবদূত দাশগুপ্ত

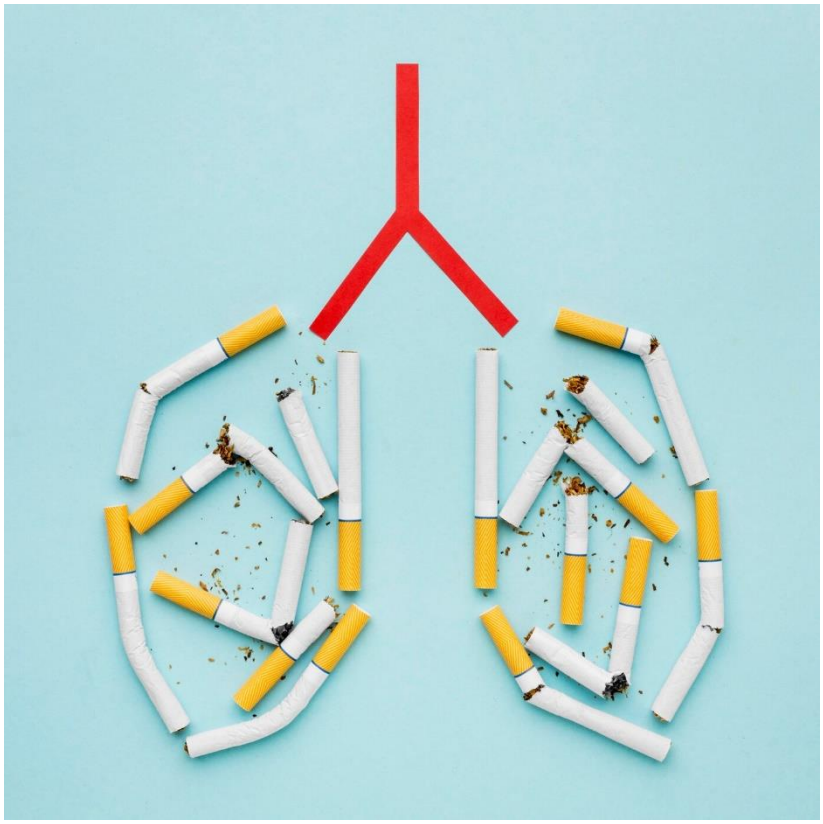

সারা বিশ্বে বাড়ছে ক্যানসারের দাপট। তার মধ্যে অন্যতম ফুসফুসের ক্যানসার। পরিসংখ্যান বলছে পশ্চিম বিশ্ব এবং ভারতে পুরুষের ক্যানসারে মৃত্যুর অন্যতম কারণ ফুসফুসের ক্যানসার।

মহিলাদের ক্ষেত্রেও ক্যানসারে মৃত্যুর প্রথম পাঁচটি কারণের অন্যতম এটি। গত কয়েক বছরে ফুসফুস ক্যানসারে মৃত্যুর ঘটনা বড় প্রভাব ফেলেছে।

প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে ধূমপান থেকে ফুসফুসের ক্যানসার এবং তা থেকে মৃত্যু হয়। তবে ধূমপান না করলেই যে ক্যানসার হবে না, তা নয়। প্রায় ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে পরোক্ষ ধূমপানের কারণেও এই রোগ হতে পারে। এমনকী ক্যান্সার হতে পারে কয়লার ধোঁয়া থেকেও ।

‘কোল টার’ –এ থাকে PAHS বা পলিসাইক্লিক অ্যারোমাটিক হাইড্রোকার্বন।

‘লো টার’ বা ফিল্টার সিগারেট থেকেও ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।

মনে করা হয়, ৩০ বছর ধরে প্রতিদিন এক প্যাকেট সিগারেট খেলে পুরুষের ক্যানসারে মৃত্যুর ঝুঁকি ২০ থেকে ৬০ গুণ বাড়তে পারে।

যতদিন যাচ্ছে মহিলাদের মধ্যেও সিগারেট খাবার প্রবণত বাড়ছে। বলা হচ্ছে যে, একই সময় মহিলারা যদি কখনও ধূমপান নাও করে থাকেন তাহলেও তাঁদের মৃত্যুর হার বাড়তে পারে ১৪ থেকে ২০ গুণ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন সময়টা ৪০ বছর হলে মৃত্যুর হার দ্বিগুণ হবে।

এ ছাড়াও নানা কারণে ক্যানসারের প্রবণত বাড়ে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে ভকরছেন। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় জানা গেছে অ্যাসবেসটস থেকে প্রায় ৭ থেকে ১০ গুণ বাড়ে ঝুঁকি। এছাড়াও ভারী ধাতু, যেমন ক্যাডমিয়াম, নিকেল, ক্রোমিয়াম। ক্যানসারের আরেকটি কারণ অবশ্যই রেডিয়েশন।

এছাড়াও সমীক্ষায় এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে জোর দেওয়া হয়েছে অবশ্যই দূষণের ওপর।

লেখা ৮

কলকাতা ময়দানে খানাপিনার কমতি নেই

জয়ন্ত চক্রবর্তী

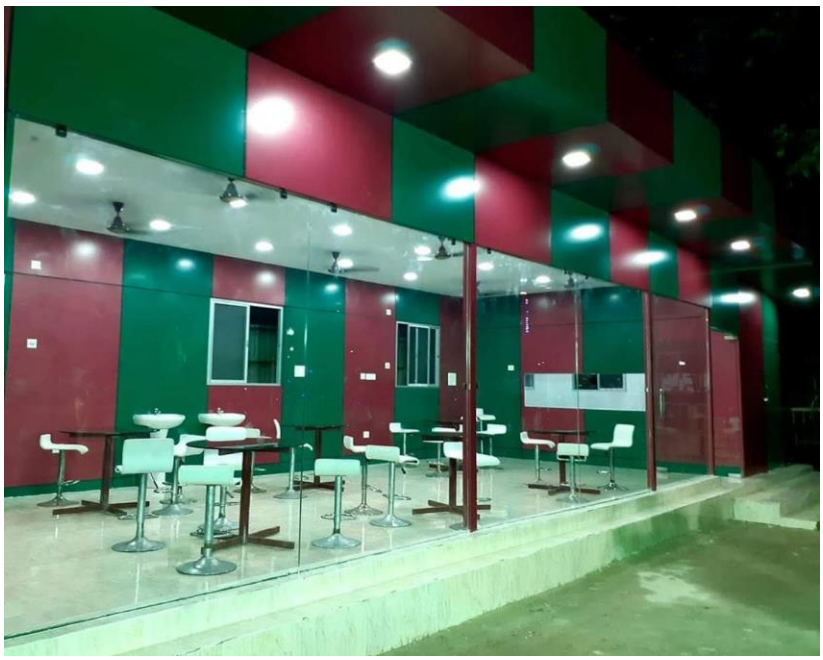

সত্তরের দশকে, আমার ছাত্রজীবনে কলকাতা ময়দানে খেলা দেখতে গেলেই অনাদির মোগলাই পরোটা আর ডাবল হাফ চা অবধারিত ছিল । তখনও সেই ভাবে মেঠো হইনি বলেই ময়দানের ক্যান্টিন গুলোর সুলুক সন্ধান পাইনি। তারপর ক্রীড়া সাংবাদিকতায় এলাম, ময়দানের গলিঘুজির কথা ঠোঁটস্থ হল, চিনে গেলাম ময়দানের বিখ্যাত ক্যান্টিনগুলি। আর মোগলাই পরোটার দাসত্ব গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি, ক্যান্টিন এর ডিরেক্টরি আমার হাতে।

মোহনবাগান মাঠে সেই সাতের দশকে অনিলদার ক্যান্টিন বেশ জনপ্রিয় ছিল, মুচমুচে টোস্ট, ঘুগনি, স্টু আর ফিশ ফ্রাই ছিল এই ক্যান্টিন এর প্রধান আকর্ষণ। মুখে চব্বিশঘন্টা রুমাল দিয়ে থাকা ধীরেন দেও নাকি অনিলদার বাটার টোস্ট এর ভক্ত ছিলেন। অনিল দার ক্যান্টিন ছিল মোহনবাগান তাঁবুর পিছন দিকে – লন সংলগ্ন। অনিলদার পর কাজু, মোহনবাগান ক্লাবের ক্যান্টিন এর দায়িত্বে এখন কাজু অনিলদার স্টু সংস্কৃতি কে বাঁচিয়ে রেখেছে।

কাজুর চিকেন, মাটন আর ভেজিটেবিল স্টু নাকি অনিলদার স্টুর থেকেও ভালো। ডুমো ডুমো চিকেন কিংবা মাটন এর টুকরোর সঙ্গে আলু, গাজর আর বিট এর সংমিশ্রনে

অদ্ভুত এক গরম ধোঁয়া ওঠা স্যুপ, মুখে দিলেই গলে যায়, মুচমুচে টোস্ট দিয়ে খাওয়ার আনন্দই আলাদা। কাজুর ক্যান্টিন এখন মোহনবাগান ক্লাব এর কল্যানে ক্যাফে হয়েছে।সুদৃশ্য কাঁচের ঘর. হাল ফ্যাশন এর আসবাবপত্র. কিন্তু খাবারের স্বাদ অটুট রয়ে গেছে। সেই ডিমের ডেভিল, চিকেন কাটলেট, ভেজিটেবিল চপ -- আহা! যেন এক নস্টালজিয়ার ছোঁয়া।

মোহনবাগান মাঠেই মিলতো গোবিন্দর ঘুগনি আর আলুর দম। কি স্বাদ সেই ঝালঝাল ঘুগনি কিংবা আলুরদমের। আলুর দম আর ঘুগনির ওপর সিদ্ধ ডিম ছড়িয়ে দিলেই দাম দ্বিগুন। সুব্রত ভট্টাচার্য, গৌতম সরকার, প্রসূন ব্যানার্জিদের প্রিয় ছিল এই ঘুগনি আলুর দম। গোবিন্দ থাকতো সদর স্ট্রিট এর যে বাড়িতেবসে রবীন্দ্রনাথ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখেছিলেন সেই বাড়িতে।

গোবিন্দর মৃত্যুর পর তার পুত্র রাহুল বাবার ব্যবসা ধরেছে।মোহনবাগান গ্যালারির তলায় রাহুলের ঘুগনি আলুরদমের সংসার সন্ধ্যা নামার ঢের আগে বিক্রি বাটা শেষ । কারণ, স্টক থাকেনা। মোহনবাগান মাঠে গেলে রাহুলের ঘুগনির স্বাদ নিতে ভুলবেন না কিংবা কাজুর ক্যান্টিন থুড়ি ক্যাফেতে যেতে ভুলবেন না। গরম গরম স্টু এই ক্যাফে - ক্যান্টিন এর সিগনেচার।

একটা সময় ছিল যখন এরিয়ান্স মাঠ আর বড়ুয়ার ক্যান্টিন প্রায় সমার্থক ছিল, ইস্টবেঙ্গল এ সেই অর্থে যেহেতু ক্যান্টিন ছিলোনা তাই বড়ুয়ার ক্যান্টিন থেকেই খাবার দাবার যেত, সেই বড়ুয়া এখন অতীত স্মৃতি মাত্র। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সুদৃশ্য ইস্টবেঙ্গল ক্যাফে। লাঞ্চ - ডিনার থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় স্নাক্স মেলে এখানে। লাউঞ্জ বার এ আছে গলা ভিজোনোর ব্যবস্থাও।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সর্ব অর্থে আধুনিক হয়েছে, এই আধুনিককতার পাশে প্রাগৈতিহাসিক হয়ে আছে অদূরের সেন্ট্রাল এক্সসাইজ ক্যান্টিন। বড় বড় ডেকচি, হাঁড়ি কুড়ির সংসার, তার মধ্যেই উড়ে যাচ্ছে প্লেটকে প্লেট চিকেন কষা আর রুটি. স্টু, মাটন কিংবা চিকেন চপ আর ডেভিল। কলকাতা ময়দানে এই ডিমের ডেভিল বিকোয় খুব বেশি পরিমাণে।

ময়দানে তো ডেভিলদের আনাগোনা কম তাহলে ডিমের ডেভিল এর এত চাহিদা কেন -- প্রশ্নটা আজও তাড়িয়ে বেড়ায়।

সেন্ট্রাল এক্সসাইজ ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে একটু ঢু মারা যাক সি আর এ ক্যান্টিনের দিকে, প্রেস ক্লাব এর লাগোয়া এই ক্যান্টিন এর রমরমা খুব, রাস্তার ধারে হওয়ায় ফ্লাইং কাস্টমার মেলে দেদার।এদের স্টু আর টোস্ট তো জগৎ বিখ্যাত, আছে কাটলেট, চপ, ঘুগনির বিস্তৃত জগৎ. বসে খাওয়ার দারুন ব্যবস্থা। ক্যালকাটা রেফারিজ আসোসিয়েশন এর ক্যান্টিন এ না খেলে ময়দান আসার মজাটাই মেলে না।

সিটি ক্লাব এর ক্যান্টিন এ দুপুরে অফিস বাবুদের লাইন পড়ে দই রুই আর রুই পোস্ত দিয়ে ভাত খাওয়ার মজাই আলাদা। ময়দানে কাবাডি টেন্ট এও মেলে দুপুরে মাছ ভাত কিংবা মাংস ভাতের আসর। এর বাইরেও ময়দানে ছড়িয়ে আছে অজস্র ছোট বড় ক্যান্টিন। আমি কেবল নামী ক্যান্টিন গুলোই বেছে নিলাম। খানার কথা তো বললাম, কিন্তু পিনা? ময়দানের ধোঁয়া ওঠা ঘড়ার চা যিনি খাননি তাঁর জীবনই বৃথা, আখের রসও মেলে ময়দানে।

তাই বলি, কলকাতা ময়দান মানেই গোল কিংবা সেঞ্চুরির খতিয়ান নয়. রসনা নিবৃত্তির হরেক আয়োজন এখানেও।

সময় ? ভবিষ্যৎ

দেবেশ সেন

z

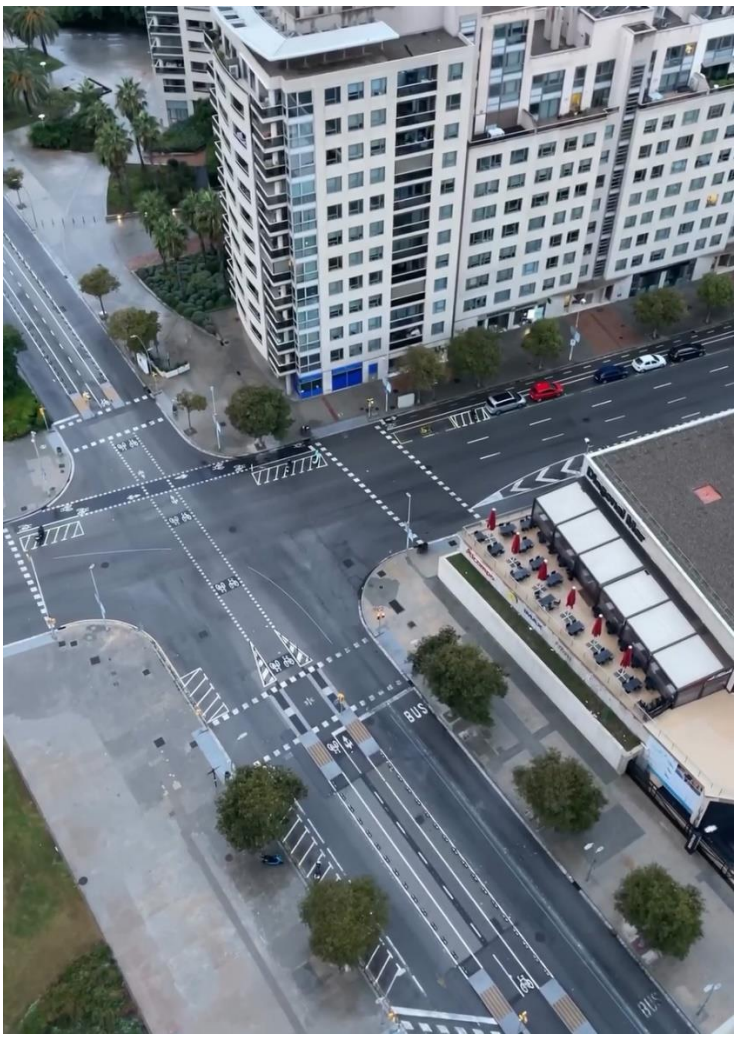

ওয়াল ই ছবিটার কথা মনে পড়ে যেতেই পারে অনেকের। সময় ভবিষ্যত। পৃথিবী পুরোপুরি জনহীন। বর্জ্যের স্তূপ বললেই ঠিক হয়। মানুষেরা সবুজ গ্রহ ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে আরেক গ্রহে। খাচ্ছেদাচ্ছে, মোটা হচ্ছে, হারাচ্ছে চলচ্ছক্তি। এ দিকে, সাধের পৃথিবীতে পড়ে রয়েছে কেবল দুটি প্রাণী, যদি রোবটকে বিতর্কে ইতি টেনে প্রাণী বলা যায় আর কী- ওয়াল ই আর একটা আরশোলা। রোবট ওয়াল ই সারা দিন ঘুরে ঘুরে পৃথিবীতে মানুষের ফেলে যাওয়া জিনিস নেড়েচেড়ে দেখে, যেটা কাজের বলে মনে হয় সংগ্রহ করে ফিরে আসে তার অকেজো স্পেস শিপে। আরশোলা সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। হলিউডের বিখ্যাত এই অ্যানিমেশন ছবির সঙ্গে টাইম ট্র্যাভেলার জেভিয়ারের তফাত কেবল দুই জায়গায়- তাঁর কোনও সঙ্গী নেই আর পৃথিবী মানুষের ফেলে যাওয়া আবর্জনার স্তূপ হয়ে যায়নি। এ বাদে বিপুলা এই ধরণীতে ওয়াল ই-র মতো তিনিও পড়ে রয়েছেন একা।

টাইম ট্র্যাভেল বাস্তবে সম্ভব না কি শুধুই কল্পবিজ্ঞানে – এ নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে। সে সবের মাঝে মাথাচাড়া দেন কিছু টাইম ট্র্যাভেলার, ভবিষ্যতের গর্ভে যা লুকিয়ে আছে, তা জানান দেন। সে সব লোকজন বিশ্বাস করে কি না, সেটা পরের প্রশ্ন, ও প্রসঙ্গে এখনই যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমাদের। আমাদের কথা আপাতত কেবল জেভিয়ারকে নিয়ে, ২০২১ সাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক। মূলত ইনস্টাগ্রাম আর টিকটকে সক্রিয় থাকেন তিনি, ভবিষ্যতের পৃথিবীর ছবি, ভিডিও পোস্ট করে চলেন। তাঁর দাবি, তিনি যে সময়ে আটক হয়ে রয়েছেন, তা ২০২৭ সাল। জেভিয়ারের কথা যদি সত্যি বলে ধরে নিতেই হয়, তাহলে আতঙ্ক জাগবে বইকি। ২০২৩ তো প্রায় শেষ হয়েই এল, ২০২৪ শুরু হল বলে। এ দিকে জেভিয়ারের ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সব ফুটেজ জনহীন, মাত্র ৩ বছর পরেই তাহলে কি জনহীন হয়ে যাবে পৃথিবী ?

লেখা ১০

এই ধুলো অমূল্য

সুগত সেন

কোথায় থাকেন ? 'বাগবাজার'! বাগবাজারে থাকি, এটা যেন ভালোবাসা জনিত এক প্রচ্ছন্ন অহংকার! যাদের পরিবার ছয়-সাত প্রজন্ম অথবা দেড়শো-দুশো বছর কি তারও বেশি সময় ধরে বাগবাজারে আছে তাদের মধ্যে বাগবাজারকে নিয়ে একটা কল্পনাবিলাস আছেই। একটা পাড়াকে নিয়ে প্রায় হাজার পাতার বই বেরিয়েছে, সেটা কেবলমাত্র বাগবাজার বলেই সম্ভব হয়েছে।

খেলুম, গেলুম, আব, নেবুগুলো, সঙ্গে, মোহনবাগান---এসব বাগবাজারী শব্দবন্ধ প্রায় অবলুপ্তির দিকে ! গিরিশবাবুকে নিয়ে অহংকার এখনও আছে। রামকৃষ্ণ ভাবধারা কতটা প্রভাবিত করছে জানি না , তবে রামকৃষ্ণ ভক্তের ঢল এখন বাগবাজারে প্রচুর। মায়ের বাড়ির প্রসাদ, বলরাম মন্দিরের খিচুড়ি, রথের ভীড় ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান। তবে এরই মধ্যে অনেক পরিবার কালস্রোতে ভেসে চলে গেছে বাগবাজার থেকে অন্য কোনো স্থানে। সুধীর সান্যালের মতো মানুষ কী আর বাগবাজারে আছেন? বাগবাজারের আড্ডা ক্ষয়িষ্ণু। যা আছে গুটিয়ে যায় রাত সাড়ে দশটার মধ্যে ! কবরেজবাড়ি নতুন করে তৈরি হওয়ায় রকটা চলে গেল ! চা-তেলেভাজা থাকলেও বাগবাজারে এখন কাবাবের দাপট ! বাগবাজারের মাঠগুলোয় এখন আর দাপিয়ে খেলা হয় না ! গৌরীমাতা উদ্যানে সাজুগুজু ক্রিকেট কোচিং আর শ্যামপার্কে হাবুর প্রচেষ্টায় ফুটবল প্রশিক্ষণ চলছে। গুঁজিয়া বা একটা কাঁচি সিগারেট বাজি রেখে নিত্যদিন গঙ্গায় এপার-ওপার আর হয় না। তবু কিছু দামাল এখনও লঞ্চ ঘাটের আশেপাশে জলকেলি করে। বাগবাজার সর্বজনীনও কালের বেগতিক উচ্ছলতায় দরজা খুলতে বাধ্য হয় ঐতিহ্য উপেক্ষা করে। মণীন্দ্রকলেজের সামনে মুস্তাফিদের বাড়ির তলার সেই অবিস্মরণীয় কচুরি-

জিলিপির ঠাকুরের দোকান আর নেই, পরিবর্তে বাগবাজারে এসেছে একগাদা Food Blogger যারা অখাদ্যকেও তকমা দিচ্ছে ঐতিহ্যবাহী বলে !

'অমর্ত্যবাজার'-এর অফিস উঠে যাওয়ার পরে বাগবাজারে আর চব্বিশ ঘন্টা চা পাওয়া যায় না। তবু বাগবাজারে ভোলাদার দোকান আছে, ছেলেরা চালায় বর্ধিত আইটেম যোগে। ভাগ্যিস এখনও চাউমিনটা যোগ করেনি ! তাসের আড্ডাগুলোও গুটিয়ে গেছে, তবু এখনও চলছে সেনবাড়িতে। কিন্তু বাগবাজারের বিখ্যাত ডান-বামের সম্মিলিত আড্ডা এখনকার রাজনৈতিক বাতাবরণে আর নেই। দুঃখ হয় ! 'আড্ডা But at the highest level' ছিল বাগবাজারের বৈশিষ্ট্য। মস্কো'-য় দেওয়ালে সাঁটা গণশক্তি পড়ছিলুম বলে বাড়িতে কে খবর দিয়েছিল, 'ছেলে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে' ! সেই সব সামাজিক চোখ এযুগে না দেখাকেই শ্রেয় মনে করে। যে বাগবাজার মনে করত মানুষ গড়তে খেলাধূলা-ব্যায়াম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেই বাগবাজারে এখন ব্যায়ামাগার জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়! আদত বাগবাজারীরা, বাগবাজারের কৈলিন্য, সংস্কৃতি বুঝি কোনঠাসা এই ChatGPT যুগে!

এমনই এক অভিজ্ঞতা হল আজ সন্ধ্যায় বিচুলি ঘাটে। সেখানে দেবদীপাবলী উদযাপিত হচ্ছিল। রাষ্ট্র যত উৎপীড়ক হচ্ছে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনতা যত দীর্ণবিদীর্ণ হচ্ছে ততই মানুষ ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকছে। এত এত দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, বড়োঠাকুরের পুজো, বজরঙ্গবলী পুজো তো আগে ছিল না। এই দেবদীপাবলী আগে তো বাগবাজারে দেখিনি। খোদ বাগবাজারে গঙ্গার তটে হিন্দিতে ফেস্টুন টাঙ্গিয়ে হর হর মহাদেব, জয় মা ভবাণী, রামজীকি সেনা চলি, জয় বজরঙ্গবলী ইত্যাদি হিন্দীতে জয়ধ্বনি নতুন চমক বৈকি! না, হিন্দীর ওপর বা হিন্দী ভাষীদের ওপর কোন বিদ্বেষ নেই। বিদ্বেষ 'হিন্দী-হিন্দু-হিন্দুস্থান' এই অপকর্মের বিরুদ্ধে। হঠাৎ বেনারসের ঢঙে গঙ্গা আরতি কেন শুরু হলো কলকাতায়? কেনই বা বাগবাজারে? বাগবাজার কি তাহলে হিন্দুত্ববাদের আখড়া হয়ে যাচ্ছে? একজন বাগবাজারী হয়ে কি করে ভুলি এখানেই, এই বাগবাজারে বলরাম বোসের বাড়িতে

১মে ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ যে সঙ্ঘ তৈরি করেছিলেন তার মূল ভাব ছিল অসাম্প্রদায়িকতা। বাগবাজার কি সেখান থেকে বিচ্যুত হচ্ছে? আড্ডা, চায়ের দোকান, তেলেভাজা, তাসখেলা ইত্যাদি সংকুচিত হোক ক্ষতি নেই কিন্তু বাগবাজারে যদি সাম্প্রদায়িক শক্তি গেড়ে বসে সেটা সহ্য করা বাগবাজারের মানুষের পক্ষে চরম অপদার্থতার পরিচয় হবে।

একটা 'পাগলের' ঘটনা দিয়ে এই লেখায় ইতিটানি। সকালে বাজার করে ফিরছি, গিরিশ এভিনিউ চৌমাথার মোড়ে, একজন মানুষ রাস্তা থেকে ধুলো তুলে বারবার মাথায় ঠেকাচ্ছেন আর বলছেন ‘শত শত মহামানবের পদধূলি ধন্য এই বাগবাজারের ধুলো, এই ধুলো অমূল্য, এই ধুলো মাথায় দিলে মহা পুণ্য হবে।’

এই সংক্রান্তি সময়ে কথাগুলোর মর্যাদা রাখার দায়িত্ব বাগবাজারের অধিবাসীদের ওপরেই বর্তায়।

পিপ্পা নিয়ে দু চারটি কথা

সুজিত কর

'Lover of Horses' – Pippa-এর আক্ষরিক অর্থ।

পরিচালক প্রথমেই গল্পের এক হিরোকে দিয়ে বলিয়ে দিয়েছেন এই গল্প এক প্রেমের গল্প --- সেটা যন্ত্রের প্রতি প্রেম হোক, কী cryptography-র প্রতি, কী নিজের পরিবারের প্রতি বা নিজের মাতৃভূমির প্রতি। সিনেমার প্রেক্ষাপট ১৯৭০-৭১ সনের পূর্ব পাকিস্তান আর সৈন্যবাহিনীর একাংশের।

সিনেমাটি The Burning Chaffees বইয়ের উপর ভিত্তি করে বানানো। ঈশান ব্রিগেডিয়ার বলরাম মেহেতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন যিনি তার ভালোবাসার কথা বলেছেন, যন্ত্রের প্রতি ভালোবাসা, নির্দিষ্ট করে বললে PT -76 ট্যাঙ্কার (PIPPA) এর কথা বলেছেন আর পরিচালক পর্দায় যন্ত্র কেই দেখিয়েছেন।

সিনেমার সারাংশ মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে FM মানেকশো এসেছেন (যিনি করেছেন মেক আপভালো লেগেছে আমার, ভিকি কৌশলকে পর্দায় দেখার আগে একেও মানানসই লেগেছে আমার) PM Mrs. Gandhi (একে দেখতে শ্রীমতি গান্ধীর মত লাগেনি আমার) এসেছেন আর বাকি ফিল্ড অফিসার যাঁরা এসেছেন তাদের সম্পূর্ণ বিবরণ টাইটেল কার্ডে দেওয়া আছে, বস্তুত পুরো ফিল্ম

কেনো এবং কিসের উপর ভিত্তি করে বানানো টাইটেল কার্ড পড়লেই হবে, সিনেমা টা ভাব সম্প্রসারণ।

অভিনয় নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই, তবে Inaamul Haq একটু নজরে এলেন। বাংলার কিছু শিল্পী কাজ করেছেন ফিল্মে। VFX বেশ ভালো, তবে শুরুতেই কেনো গ্রাফিক্স ব্যবহার করলেন বুঝলাম না ১৯৭১ নিয়ে যথেষ্ট ছবি মজুত থাকার পরেও।

এবার বলি সবচেয়ে আলোড়িত গান বা বলা ভালো যার জন্য পুরো সোশাল মিডিয়া তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে সেই নিয়ে। 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানটা সিনেমায় খুব বেশি হলেও ৪০ সেকেন্ডের জায়গা নিয়েছে, তাই গানটা ফিল্ম প্রমোশনের জন্য আলাদা করে বানানো হয়েছে আমার বিশ্বাস। কিন্তু তারপর BGM হিসাবে যা এসেছে সেটা আমার ভালো লাগেনি। BGM সব জায়গায় খারাপ নয়, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় অবাস্তব আর অস্বাভাবিক। মানে কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ কামানের গর্জনের মতো যদি গানকে বিপ্লবের প্রতীক বানানো হয় সেটা বিরক্তির উদ্রেক করে (ডিটেইলস আমি বলব না)। কী জানি পরিচালক কৃষ্ণ মেননের হয়তো রহমান সাহেবের সঙ্গে বিশেষ সখ্যতা আছে !! সিনেমাটি কিছুটা মিউজিক্যাল journey হতে চেয়েছিল হয়তো , কারণ ৩ টে সহ আরো গান আছে। আমি কোনো কিছুই বোদ্ধা নই, সঙ্গীত বোদ্ধা তো নইই, তাই এগুলো একান্তই আমার ব্যক্তিগত মত আর রিভিউ দেওয়ার কু-অভ্যাস।

সিনেমার ভালো অংশ আমার কাছে প্রথম দিকে একটি অংশ, ঈশান সম্ভবত ভালো নাচেন, আমি ওর কাজ আগে দেখিনি। আর বাকি সিনেমা বোঝার জন্য আমি বইয়ের উপর ভরসা করে নেব।

জয় বাংলা স্লোগান মুক্তি বাহিনীর ছিল সেটা পড়েছি, কিন্তু নীল সাদা শাড়ি ও ফিল্মের অনুপ্রেরণা কি ? উত্তর খুঁজছি.... (কেনো বললাম জানতে হলে তো দেখতে হবে প্রাইম ভিডিওতে)

ও হ্যাঁ মেনন বাবু ১৯৭১ এ বাংলাদেশ থুড়ি পূর্ব পাকিস্তানে ইলিশের দাম কত ছিল খোঁজ নিয়েছিলেন, নাকি পদ্মায় ইলিশ গড়াগড়ি যায় ?

মোহময়ী কুর্গ (প্রথম ভাগ)

প্রভাত ভট্টাচার্য

এই দেশের মধ্যেই রয়েছে এমন কিছু মোহময়, রোমাঞ্চকর জায়গা যেখানে বেড়াতে গেলে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে ওঠে নতুনের আহ্বানে। এরকমই একটি জায়গা কুর্গ নিয়ে শুরু হল নতুন ভ্রমণ কাহিনী। প্রথম অংশ রইলো এই সংখ্যায়…

কুর্গের কথা আমি প্রথম জানতে পারলাম ফেসবুক থেকে। শ্রী দিগন্ত বেরা নামে এক ভ্রমণপিপাসু ব্যক্তির ফেসবুক পোস্টের কুর্গে ঘোরা নিয়ে লেখা ও ছবি দেখে আমার ভীষণ ভালো লাগে, আর ভেবে নিই, এখানে যেতেই হবে।

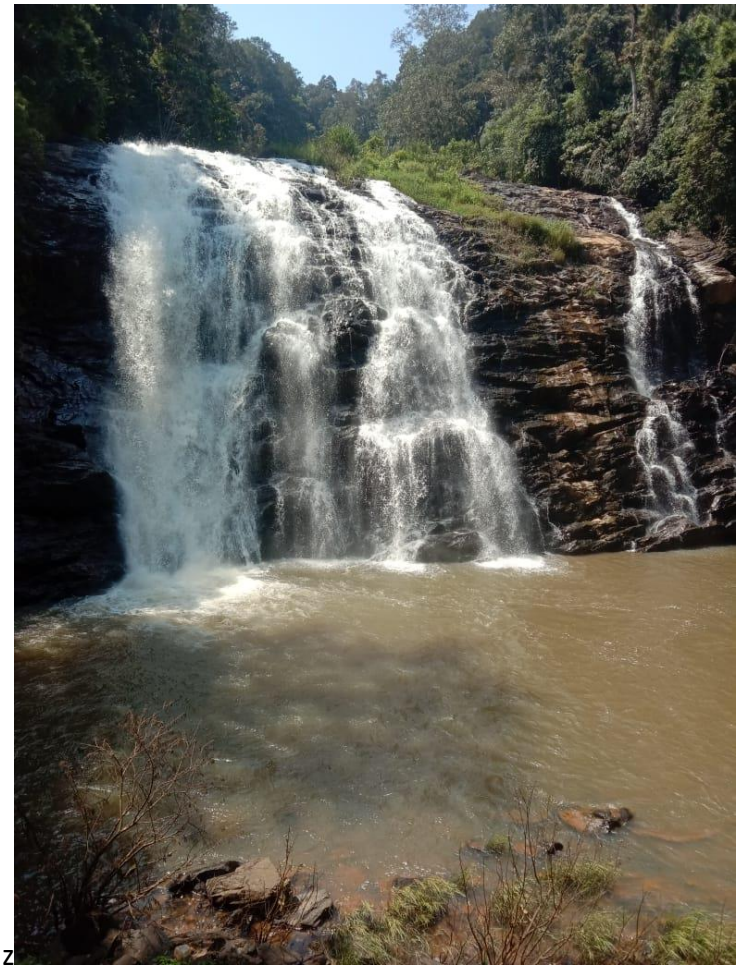

আমরা ঘুরতে খুব ভালোবাসি। বছরে চার পাঁচবার তো হয়েই যায়। আসলে কাজের চাপের ফাঁকে ফাঁকে এই ঘোরার ব্যাপারটা অক্সিজেনের মত কাজ করে। এবারে আমরা ঠিক করলাম যে দুর্গাপুজোর সময় ঘুরে আসা হবে বাঙ্গালোর , মাইসোর, কুর্গ থেকে।

সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে আমরা রওনা হলাম। মনটা বেশ খুশি খুশি ।

প্রথমে বাঙ্গালোর ,তারপরে মাইসোর, সেখান থেকে কুর্গ । বাঙ্গালোর ,মাইসোর আমরা আগে ঘুরেছি। এখন তো বলা হয়, বেঙ্গালুরু ,মাইসুরু ।

মাইসোরে দেখা হল মাইসোর প্যালেস, মাইসোর জু,, ওয়াক্স মিউজিয়াম, টানেল অ্যাকোরিয়াম ,এইসব। গাড়ি ঠিক করা ছিলই ,যা পুরো সময় ঘোরাবে। তাতে করে চললাম কুর্গের দিকে।

অজানা জায়গা দেখার একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে। সেটা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না । মাঝখানে খেয়ে নেওয়া হল। দোসা বেশ ভালো খেতে, সঙ্গে এখানকার বিখ্যাত কফি। গাড়ির চালকের নাম রাবণ, কিন্তু বেশ ভালোমানুষ ।

z

পথের দু ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম কুর্গে । আমাদের হোটেলের নাম কুর্গ প্যালেস । খুব সুন্দর। নীলাঞ্জনা আর রূপকথার ও খুব ভালো লেগেছে।

এখানকার আবহাওয়া বেশ মনোরম। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। কাল সকালে যাওয়া হবে সবকিছু ঘুরে দেখতে। তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পরে বেরোনো হল। রাবণ অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য।

কুর্গ সম্পর্কে একটু পড়ে নিয়েছিলাম নেট থেকে। কর্ণাটকের এই জেলার নাম এখন কোডাগু ।আগে এটি ছিল একটি পৃথক রাজ্য। পরবর্তী কালে এই জায়গা বৃহত্তর মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় । এই জায়গার আদি বাসিন্দা ছিল কোডাভারা। হালেরি রাজবংশ

বেশ কিছুদিন এই জায়গা শাসন করেছিল ।এরপর এটি চলে আসে ব্রিটিশদের অধীনে। তারপরে স্বাধীন ভারতের অংশ হিসেবে থাকে।

এই জেলার প্রধান শহর হল মাদিকেরি।

দ্বিতীয় ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

লেখা ১৩

অজানার উজানে (তৃতীয় ভাগ)

বাবলু সাহা

এই বাংলার আনাচে কানাচে রয়েছে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের জন্য দারুন দারুন সব জায়গা। এরকমই একটি জায়গার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে চলছে ধারাবাহিক রচনা। তৃতীয় অংশ রইলো এই সংখ্যায়…

ছোটোবেলায় স্কুলের সামনে হজমিওয়ালার কাছ থেকে কারেন্ট লবণ মাখানো ছোটো ছোটো কুল খেতাম মনে আছে ? দেখি কী , গাছভর্তি সেই কুল। অসংখ্য বুনো লতা-পাতা এবং নাম না জানা বড়ো মাঝারি গাছের জঙ্গল। হঠাৎ এক জায়গায় ঝোপের মধ্যে আবিষ্কার করলাম ময়ূরের ডিম। যদিও তখনো ময়ূর চোখে পড়েনি। এরপর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম একটি লুকোনো গুহা , যে গুহায় প্রবেশ করতে হলে মানুষকে কিছুটা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে।

কৌতূহলবশত নিচু হয়ে গুহার মধ্যে উঁকি মারতেই চমক। প্রথমে তো সোনুকে দেখলাম ভীত সন্ত্রস্ত চোখে ছিটকে যেতে। ভালোভাবে প্রায়ান্ধকার গুহায় চোখ সইয়ে নিয়ে দেখি, প্রায় ১৪-১৫ ফুট লম্বা একটা রক পাইথন গুটিয়ে শুয়ে রয়েছে। তার কিছুটা পিছনে কয়েকটি জ্বলজ্বলে চোখ।

পরে ক্যাম্প চলাকালীন উলটো দিকে তুলনামূলক ছোটো দুটি পাহাড়, যেখানে পাহাড়ে চড়ার এক জঙ্গল , প্রকৃতি এসব চেনার শিক্ষার আসর বসেছিল, সেখানেও ছোটো গুহার

ভিতরে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল এই রক পাইথনের। আর ছিল অজস্র পেঁচা , গ্রিন বী-ইটার পাখির ঝাঁক।

এবং স্থানীয় বকরিওয়ালাদের মুখে শোনা গিয়েছিল যে, কিছু দিন আগেই দেখা গিয়েছিল তাদের একটি ছাগল (ওই কানাবুরু পাহাড় থেকে চরিয়ে সমতলে নামার পর) গুনতিতে কম হচ্ছে। তারপর তারা পাহাড়ে উঠে দেখে যে সেই হারানো ছাগলটিকে এরকমই একটি পাইথন ততক্ষণে প্রায় অর্ধেক গিলে ফেলেছে। সেই অবস্থায় তারা বড়ো ধারালো দা দিয়ে কোপের পর কোপ দিয়ে সাপের মাথা ধড় থেকে আলাদা করে তবে সেই ছাগলকে উদ্ধার করে। যদিও স্বাভাবিক ভাবেই সে আর বাঁচেনি ।

যাই হোক, আবার আমাদের হারিয়ে যাবার গল্পে ফিরি।

ঘড়িতে দেখলাম তখন বাজে তিনটে। এর মধ্যে কয়েকবার নিচে এক রকম প্রায় অসহায়ের মতো বসে থাকা চট্টোদার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁরই বা কী করার আছে ! কারণ, একে তিনি একলা, তার ওপর ভদ্রলোক আবার নিজে খুড়িয়ে হাঁটেন। একেবারে শেষ গ্রাম, যেটা আসার সময়ে আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, সেটা এখান থেকে কম করেও বেশ কয়েক কিমি দূরে। ত্রিসীমানায় কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। সোনু তো লোকাল ছেলে, ইন্তু তার ফোনের চার্জ শেষ। এদিকে আমার ফোনে বন্ধুদের শুভেচ্ছার ঢল আসছে। উত্তর দেব কী ! সে পরিস্থিতিই নেই। আর তারাই বা জানবে কী করে যে আমি কোথায় কী বিপদে পড়েছি ! জানিয়েও কিছু ফল হবার নয়। কারণ, ফোনে তো কাউকে পথ দেখানো যায় না ।

শেষমেশ হঠাৎ, প্রায় তখন পৌনে চারটে প্রায়, ফোন বেজে উঠল। কে ? না, চট্টোদা। কী সংবাদ ! না, নিচে বসে থাকতে থাকতে চট্টোদা নাকি আচমকা চোখে পড়েছে ঠিক উলটো দিকের ছোটো পাহাড়টায় নাকি দুটি আদিবাসী ছেলে খেলার ছলে উঠছে নামছে। তাদের তরতর করে ওঠা নামা দেখে চট্টোদা জোরে হাঁক দিয়ে ডেকে সব বৃত্তান্ত

বলেছেন। তারপর অনুরোধ করেছেন তারা যেন এই পাহাড়ে উঠে আমাদের পথ দেখিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসে।

আশার কথা বটে, কিন্তু সে আশা কি শেষ পর্যন্ত সফল হবে ! খুব উৎসাহ কিছু পেলাম না বটে , আবার অপেক্ষাও করতে লাগলাম। যদি ...

চতুর্থ ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

স্বপ্নভঙ্গ

অর্জুন দাশ

প্রধানমন্ত্রীকে যে শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের হাতেই তুলে দিতে হবে বিশ্বকাপ এটা স্বপ্নেও কি ভেবেছিল ভারত ? অথচ ঘটনা যখন তা-ই ঘটছে তখন সারা ভারত নিশ্চুপ : কারণ, এমন যে আদৌ হতে পারে নয়, হচ্ছে, এটাই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না গোটা দেশ।আমেদাবাদে গ্যালারিতে যেদিকে তাকানো যাচ্ছিল স্বাভাবিক ভাবেই কারো মুখে হাসি থাকার কথা নয়, ছিলও না, কিন্তু দেখে মনে হতে বাধ্য এ যেন খেলার মাঠ নয়, এ প্রায় দেশের মরণ বাঁচন লড়াইয়ের আসর, যেখান থেকে মাথা নিচু করে ফিরে যেতে বুক ভেঙে যাচ্ছে যে কোনো বয়েসের ভারতীয়ের।

আসলে কথাটা ঠিকই। জাতীয় আবেগের বাঁধনে যখন খেলা বাঁধা পড়ে যায় তখন বোধহয় এরকমই হবার কথা। এবং সেটাই হয়েছে। একটা দল ভালো খেলে জয় ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আর অন্য দল জাতির আবেগকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে না পেরে , যথাযোগ্য উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে না পেরে লজ্জায় অধোবদন। আসলে খেলার মাঠ যদি লড়াইয়ের ময়দান হয়ে দাঁড়ায় তখন তার চাপ বহন করা যে কতখানি কঠিন এটা আজ ভারতীয় দলের যে কাউকে দেখলেই হাড়ে হাড়ে বোঝা যাচ্ছে। বুকে পাথর বেঁধে তাই স্বীকার করে নিতে হচ্ছে গোটা প্রতিযোগিতায় পারফরম্যান্স বড় কথা নয়

তেমন, একটা দলের একদিনের ভালো খেলে যেতে পারাকেই হ্যাটস অফফ করতে হুজুরে হাজির গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। এটাই স্বপ্নভঙ্গ। এটাই ব্যর্থতা । যার গ্লানি অপরিসীম।

প্রথমে ব্যাট করে কোনো ক্রমে ২৪০ তুলেছিল ভারত। তখনই কু ডেকেছিল মনে। কিন্তু ৪২ বল বাকি থাকতেই যে অজিরা জয় ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে এটা অন্তত মনে হয়নি একটি বারের জন্যেও।বিশেষ করে যেখানে সর্বোচ্চ মানের ক্রিকেট উপহার দিতে পেরেছে কোনো দল। ফলে চোখের সামনে স্বপ্নের বহুতল আচমকা ধ্বসে যেতে দেখলে চূড়ান্ত পেশাদারেরও হাঁটু কেঁপে যাওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু কেন এই ইংরেজিতে যাকে বলে মিসহ্যাপ ! বিশেষজ্ঞ মহলে কান পাতুন , পেয়ে যাবেন হাজারো থিওরি। যেমন, উইকেট। মুখে মুখে ঘুরছে একটাই কথা : ফাইনালে স্লো পিচ ভারতের জন্যে ভয়াবহ হয়েছে। বিশেষ করে প্রথম অর্ধে স্রেফ এই জন্যেই যেখানে রান করাই কঠিন হচ্ছিল। তারপর স্পিনারদের ব্যর্থতা । খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে এই প্রথমই বোধহয় গোটা টুর্নামেন্টে পুরো ২০ ওভারে স্পিনাররা উইকেট পাননি। সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার দুরন্ত উইকেট স্টাডি।নইলে টসে জিতেও ফিল্ডিং নেওয়ার দুঃসাহস দেখায় কেউ ! সঙ্গে বোলিং-এ অদ্ভুত চোখে পড়ার মতো শৃঙ্খলা । এখানেও লীড করেছেন কে ? না, কামিন্স।

কথায় বলে ওয়ান ব্যাড ডে মিনস দেয়ার ইজ নো নেক্সট ডে। অথচ , স্পোর্টসের আসল রহস্যই তো একটা জায়গায় , যে, সেরার মুকুট আর নিষ্ঠুর ফলাফলের মধ্যে ফারাক কেবল এক চুলের --- যার নাম কেউ বলেন ভাগ্য , আবার কেউ পুরুষকার।এরই ফল : দুরন্ত শতরানে ম্যাচের নায়ক ট্রাভিস হেড। মানতে যত খারাপ লাগুক তাঁর ১২০ বলে ১৩৭ রানের ইনিংসই বুলডোজার চালিয়ে দিল স্বপ্নের প্রাসাদের অলিন্দে।

কেউ কেউ বলছেন আসলে প্রত্যাশার চাপটাই নিতে পারলেন না রোহিতরা । শচীন তেন্ডুলকারের হাজার সান্ত্বনার ছোঁয়াতেও এই ফলাফলের হতাশা মোছার নয়।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন